শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিকে আনন্দময়করণ

মো: সাইফুল্লাহ

খুব ছোট্টবেলায় আমরা একটা বাক্যের সাথে পরিচিত হয়েছি।
"জ্ঞান অর্জনের জন্যে সুদূর চীন দেশে যাও।"
তবে এখন অবশ্য চীন দেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। শহরের মোড়ে মোড়ে জ্ঞান বাণিজ্যের মহা - উৎসব চলছে। আবাসিক ভবন গুলো এখন আর শুধু থাকার কাজে ব্যবহার হয় না। সেসব ভবনের দুই একটি ফ্লোর ভাড়া নিয়ে এখন শিক্ষার কাজেও ব্যবহার হয়। এতে কি প্রমাণ হচ্ছে? মানুষ শিক্ষা খুব আনন্দ নিয়ে গ্রহণ করছে বলে শিক্ষার এত প্রসার? অবশ্যই না। শিক্ষা এখন গ্রহণ করার অবস্থানে নেই। এটি হয়ে গিয়েছে লাভজনক বাণিজ্যিক কার্যক্রম।

এতটাই লাভজনক যে, পাড়া মহল্লাগুলোতে বাড়ির নিচে নিচে দুই চার রুম ভাড়া নিয়ে শিশুদের কিন্ডারগার্ডেন স্কুল হচ্ছে দেদারসে। সেখানে খেলার মাঠ তো দূরের কথা, আরামে দাঁড়ানোর জন্যও বাড়তি এতটুকু জায়গা নেই। সেখানে, সাংস্কৃতিক চর্চা তো দূরে থাকুক একটু মনের মতো কথা বলারও সুযোগ নেই।

আর কোচিং সেন্টারের কথা বলে শেষ করা যাবে না। শহরে আজকাল শিক্ষক নেই, সব যেনো হয়ে গিয়েছে 'রেজাল্ট মেশিন'। এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে গেলে কিছু শেখা যাবে। সবাই বলে, "আমার কাছে আসো, আমি রেজাল্ট ভালো করে দিবো। নিশ্চিত এ+ গ্যারান্টি।" এখন আর কাউকে বলতে শোনা যায় না, "মানুষের মতো মানুষ হও।" সবাই বলে, "রেজাল্টটা কিন্তু ভালো করতে হবে।"

একটা অদ্ভুত মোহে যেনো আমাদের এই নগর আক্রান্ত। মোহটা হচ্ছে সার্টিফিকেট অর্জনের মোহ। অনর্থক প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের ঠেলে দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষার্থী বানানোর মোহ। কেউ আজকাল শিক্ষার্থী নেই, সবাই হয়ে যাচ্ছে পরীক্ষার্থী।

জীবন নিতান্তই এক পুনরাবৃত্তি চক্রে আটকে গিয়েছে। একটা শিশু সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠিকমতো হাত-মুখ না ধুয়েই কোচিং এর পথে হাঁটছে। নাস্তাটাও করার সময় পাচ্ছে না। তারপর যানজট ঠেলে বাসে ঝুলে ঝুলে স্কুলে যাচ্ছে। ক্লান্তিকর ক্লাস এবং একগাদা বাড়ির কাজের বোঝা নিয়ে বিকেলে বাড়ি এসেই আবার কোনো একটা কোচিং এ ছুটে যাচ্ছে। সন্ধ্যায় বাড়িতে আবার বসতে হয় একাধিক প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে। এভাবেই প্রতিটি দিন একই রকম চক্রে আটকে যাচ্ছে তাদের জীবন।

মুনীর চৌধুরী বলেছিলেন, **"যে ভালো রেজাল্ট করে, সে মাত্র তিন ঘন্টার জন্য ভালো ছাত্র; সে বাকি জীবনের জন্য ভালো ছাত্র কি না, জগতের জন্য ভালো কি না, তা পরীক্ষার ফল দিয়ে প্রমাণিত হয় না।"**

কিন্তু, অভিভাবকেরা এখন ছেলে মেয়ে মানুষ করা বলতেই বোঝেন পরীক্ষায় ভালো ফলাফল। তারা সবসময় এক ধরণের প্রত্যাশার চাপের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন ছেলেমেয়েদের। বাবা-মায়েদের কাছে পাশের বাড়ির অমুকের ছেলে-মেয়েরাই সর্বোচ্চ আইকন। বাবা মায়েরা চায় না ছেলে-মেয়ে আইনস্টাইন হবে, রবীন্দ্রনাথ হবে, বিল গেটস্ হবে। অতটুকু বিশ্বাস খুব কমজনই রাখে। তারা চিন্তা করে, "আমার সন্তানকে হতে হবে পাশের বাড়ির ওই মেডিকেল কিংবা পাবলিকে পড়া লক্ষ্মী ছেলেটির মতো। ওই ছেলে/মেয়েটির মতো আমার ছেলেমেয়েকেও ডাবল গোল্ডেন পেতে হবে।" কি অদ্ভুত!

সম্প্রতি বাংলাদেশে বোর্ড পরীক্ষাগুলোর ফলাফল দেয়ার পর আত্মহত্যার ঘটনা অতীতের তুলনায় বেশ বেড়েছে। কেউ কেউ সুইসাইড নোট লিখে গিয়েছে। সেখানে তারা বলেছে, **"পরিবারের চাপ, প্রতিবেশীদের খোঁচা, বন্ধুদের টিটকারি তারা আর সহ্য করতে পারছে না। তাই মুক্তির পথ হিসেবে আত্মহত্যার পথকেই তারা বেঁছে নিয়েছে।"**

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই হতাশায় ভুগছে। কারণ ক্লাসের লেকচার যারা দিচ্ছেন তারা গৎবাঁধা কথা বলছেন। যে কোর্সগুলো পড়ানো হচ্ছে সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগ নেই। এই শিক্ষা ব্যবস্থার কতটুকু আসলে শিক্ষা তা পরিমাপ করার উপায় কি? এই শিক্ষা কতটুকু আনন্দদায়ক? সৃজনশীল পদ্ধতি কি আদৌ আমাদেরকে সৃজনশীল করে তুলতে পেরেছে?

অন্য দেশগুলোতে শিক্ষা কতটা আনন্দদায়ক: বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই আনন্দময় শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন আছে, যেখানে শিক্ষাকে বাণিজ্য হিসেবে দেখা হয় না, বরং সত্যিকারের জ্ঞান অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়। কয়েকটি দেশের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে -

নেদারল্যান্ডস: ২০১৩ সালে ইউনিসেফ এর এক প্রতিবেদন বলছে, নেদারল্যান্ডসের শিশুরা সবচেয়ে বেশি সুখি জীবন কাটায়। এর কারণ হচ্ছে, মাধ্যমিক পর্যায়ের আগে স্কুলে তাদেরকে কোনো বাড়ির কাজ দেয়া হয় না। এছাড়াও, লেখাপড়ার জন্যে নেই তাদের উপর কোনো বাড়তি চাপ।

অস্ট্রেলিয়া: সেখানকার একটি স্কুলের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। রাজধানী ক্যানবেরায় অবস্থিত স্কুলটির নাম রেড হিল স্কুল। এখানে লেভেল টু'র ছাত্রকেও সকাল ৭টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত স্কুলে রাখা হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের দেশের মতো সেখানে কোনো ধরাবাঁধা সিলেবাস নেই। যদিও তাদেরও পাঠ্যবই আছে। কিন্তু শিক্ষকরা এমনভাবে পড়ান যেনো ছাত্ররা শুধু বই মুখস্থ করা শিক্ষাতে ডুবে না যায়।

আমেরিকা: আচ্ছা এদের স্কুলগুলোতে কিভাবে পড়ানো হয়? এত উন্নত দেশের স্কুলে নিশ্চয়ই অনেক পড়ালেখা? অঙ্ক, নামতা, ভূগোল? তারাও কি এসব পড়ছে? উত্তর হচ্ছে তারাও পড়ছে তবে অন্যভাবে। ছোট ছোট ধাপের মাধ্যমে, খেলাচ্ছলে। এক লাফেই সব গেলানো হয়না তাদেরকে। একদম ছোট বয়স থেকে তারা প্রচুর কাগজ কাটাকাটি করে, ছবি আঁকাআঁকি করে।

ফিনল্যান্ড: পৃথিবীর সেরা শিক্ষা ব্যবস্থার একটি হচ্ছে ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা। এখানে ১৬ বছর বয়স হলে কেবল একটি পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। ক্লাসের ফাঁকে তাদেরকে অবসর সময় দেয়া হয় যাতে পরবর্তী ক্লাস মনযোগ দিয়ে করতে পারে। মানসিক ও শারীরিক বিকাশে বিভিন্ন কার্যক্রম ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনা। বিনোদনের জন্য রয়েছে নানা ব্যবস্থা।

শিক্ষাগ্রহণকে আনন্দময় করতে যে ধরণের উদ্যোগ নেয়া জরুরি:

মুখস্থবিদ্যার মুখ বন্ধকরণ: ছোটবেলায় প্রায় সবাইকেই "এইম ইন লাইফ" রচনা লিখতে হয়। সেখানে দেখা যায় প্রায় প্রত্যেকেই লিখছে তারা বড় হয়ে ডাক্তার হবে, কেউ লিখছে, শিক্ষক হবে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার কিংবা পাইলট হবে। এসব তাদের সত্যিকারের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য যে নয় তা পরিষ্কার হয়ে উঠে তাদের মুখস্থবিদ্যার চিত্রে। প্রায় প্রত্যেকেই সেটাই লিখে যেটা লিখে পরীক্ষায় নম্বর বেশি পাওয়া যাবে, তারা সেটাই মুখস্থ করে যা বইয়ে দেয়া আছে। কিন্তু শিক্ষা তখনই আনন্দময় হবে যখন ক্লাসে তাদের মুখস্থবিদ্যা উগরে দেয়া বন্ধ হবে। বরং, তাদের শেখাতে হবে একজন সত্যিকারের ডাক্তারের গল্প, একজন শিক্ষকের গল্প যারা তাদের মহানুভবতা দিয়ে সমাজের উপকার করে গিয়েছেন। সত্যিকারের বাস্তব গল্প যখন তারা জানবে তখন নিজেরাই অনুপ্রাণিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তারা কি হতে চায়!

প্রতিযোগিতা হোক শুধু নিজের সাথে: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরীক্ষার ফলাফলটাকেই মুখ্য হিসেবে ধরা হয়। ফলাফল দেয়ার পর কে প্রথম, কে দ্বিতীয় হয়েছে সেটা নিয়েই সবার মাথাব্যাথা। ফলে যে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় সেটা বরং জ্ঞান অর্জনে বাঁধার সৃষ্টি করে। শিক্ষাগ্রহণ ততক্ষণ আনন্দময় থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত এটাকে বাধ্যবাধকতা হিসেবে না দেখা হয়। ছোটবেলায় বাবা-মায়েরা যখন সন্তানকে এ ফর এ্যাপল, বি ফর বল শেখান তখন কিন্তু ছেলেমেয়েদের মধ্যে আগ্রহ থাকে। তারা শিখতে চায়। যখন কেউ কোনো গল্পের বই অথবা তথ্যমূলক বই পড়ে সেটা তারা যথেষ্ট মনযোগ দিয়েই পড়ে। তারচেয়ে বড় কথা, এই পড়াগুলো তারা মনেও রাখতে পারে। এটি কেনো হয়? কারণ, এখানে প্রতিযোগিতাটা শুধুই নিজের সাথে। এখানে ফলাফল ভালো কিংবা খারাপের কোনো চাপ থাকে না।

সামান্য প্রশংসাই সেরাটুকু বের করে আনতে পারে: শিশুদেরকে যখন কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হয় সেটা তারা খুব দ্রুত বলে দিতে পারে। কারণ, শিশুরা যা-ই বলুক আমরা সেটাকে খুবই প্রশংসা করি। কিন্তু একই শিশু পরবর্তীতে হয়ত ক্লাসে কোনো বিষয়ে বলার ইচ্ছে থাকলেও বলেনা। চুপ করে থাকে। কারণ, সে সবসময় এই ভয়ে থাকে যে যদি তার কথা শিক্ষক গ্রহণ না করে তিরস্কার করেন কিংবা তার কথার ভুল ধরে ক্লাসে সবার সামনে অপমানসূচক কথা বলেন।
মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রত্যেকটা মানুষ একই জিনিসকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করতে পারে। ক্লাসের ব্যাপারেও একই রকম। শিক্ষক যদি প্রশ্ন করে শুধু বই এর মতো উত্তর আশা করেন তাহলে অনেকেই উত্তর দিতে আগ্রহী হবে না। কিন্তু, শিক্ষক যদি সবার মতামতকে গ্রহণ করেন এবং তাদের মতপ্রকাশের আগ্রহকে প্রশংসা করেন তাহলে শিক্ষা অনেকাংশেই আনন্দদায়ক হবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে।

স্থিরচিত্রের মাধ্যমে অথবা ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে পড়ানো: আমরা যা শুনি তার খুব কম অংশই মনে রাখি। অথচ, যখন আমরা কোনো ছবি দেখি কিংবা কোনো ভিডিও দেখি ইউটিউবে সেটার সারমর্ম খুব সহজেই আমরা মনে রাখতে পারি। এখন ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। অনেক ক্লাসরুমকে ডিজিটালাইজেশন করাও হয়েছে। শিক্ষাকে আনন্দময় করার ক্ষেত্রে এই ডিজিটাল টুলসগুলোকে কাজে লাগানো যেতে পারে। আকর্ষণীয় স্থিরচিত্র এবং ভিডিও চিত্রের সাহায্যে বই এর বিভিন্ন তথ্যকে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

ব্যবহারিক প্রয়োগ: "আমি শুনলাম এবং ভুলে গেলাম, আমি দেখলাম এবং মনে রাখলাম, আমি করলাম আর বুঝতেও পারলাম।" চীনা প্রবাদ

পড়ালেখা আনন্দময় না হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ কি? সম্ভবত, কি পড়ছি এবং কেনো পড়ছি সেটির উদ্দেশ্য খুঁজে না পাওয়া। শিক্ষাগ্রহণকে আনন্দময় করতে হলে তাকে পাঠ্যবই এর মাঝেই আটকে রাখলে হবেনা। ব্যবহারিক কিংবা বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে যা পড়ছি সেটি আসলে কি কাজে লাগছে! যে পড়াকে ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে রুপ দেয়া যাবে না, সেটি পড়িয়ে আদৌ কোনো লাভ হয় না। শিক্ষার কাজ নতুন কিছু শেখানো, তোতাপাখি তো বাজারেই কিনতে পাওয়া যায়।

সহশিক্ষা কার্যক্রমকে মূল শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা: বাংলাদেশে চাকরিগুলোতে যখন ভাইভা নেয়া হয় তখন তারা এমন কাউকে খোঁজেন যার শিক্ষাজীবনে "এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিজ" খুব ভালো। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন পড়ানো হয়, তখন কোর্স আউটলাইনে সহশিক্ষা কার্যক্রমকে আমলেই নেয়া হয়না। বরং, এমন ভাবে ক্লাস শিডিউল করা হয় যে, তথাকথিত মূল ধারার পড়ার বাইরে সহশিক্ষা কার্যক্রমে সময় দেয়া কঠিন। তাছাড়া, অভিভাবকেরাও অনেক সময় পড়ার বাইরে সামাজিক কাজে তেমন উৎসাহ দেন না। কারণ, এতে কোনো বাড়তি নাম্বার নাই। এই মানসিকতা ছাত্রছাত্রীদেরকে উভয় সংকটে ফেলে দিচ্ছে। তাই সহশিক্ষা কার্যক্রমকে যদি মূল শিক্ষার সাথে যুক্ত করা যায় তাহলে একদিকে এটি ভবিষ্যতের জন্যে ভালো তো হবেই, তার উপর বর্তমান পড়াশুনার সময়টাকেও আনন্দময় করে তুলবে।

কৌতূহল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পড়ানো: উইলিয়াম আর্থার ওয়ার্ডের একটি উক্তি আছে - **"মাঝারি মানের শিক্ষক বলেন, ভাল শিক্ষক বুঝিয়ে দেন, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক করে দেখান। মহান শিক্ষক অনুপ্রাণিত করেন।"**
কিন্তু আমাদের দেশে মহান শিক্ষকের সংখ্যা তত বেশি নয়। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন শিক্ষকেরা পড়াতেন, তাদের ক্লাস করবার জন্য অন্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও চলে আসতেন। জায়গা না পেয়ে অনেকেই দাঁড়িয়ে ক্লাস করতো। এই শিক্ষকদের গুণ কি? তারা আসলে পড়ালেখার মধ্যে আনন্দ বিলাতেন। এই আনন্দটাই শিক্ষার আনন্দ, জ্ঞানের আনন্দ। তারা এটা কিভাবে ছড়াতেন? তারা জ্ঞানের আনন্দ ছড়াতেন কৌতূহল সৃষ্টির মাধ্যমে। তাদের পড়ানোর ষ্টাইল ছিলো স্টোরি-টেলিং এর মতো। একজন সফল ঔপন্যাসিক যেমন তার উপন্যাসে পাঠকের কৌতূহল ধরে রাখেন, তারা ছিলেন তেমন ধরণের। শিক্ষার মধ্যে কৌতূহল না থাকলে সেখানে কোনো আনন্দ থাকে না।

"আপনি একদিনের জন্য একটা ছাত্রকে একটা পড়া পড়াতে পারেন; কিন্তু যদি তাকে আপনি কৌতূহলী হতে শেখান সে যতদিন বাঁচবে শিক্ষা চালিয়েই যাবে।"
- ক্লে পি. বেডফোর্ড। ■

EDGE EDUCATION